স্বল্প কথা

বাংলা সাহিত্যে ও প্রকাশনায় গত পাঁচ দশকে অবিস্মরণীয় ঘটনাগুলির মধ্যে অবশ্যই ছিল কবি জীবনানন্দ দাশের উপন্যাস ও গল্পকার হিসাবে আবিষ্কৃত হওয়া। পরম যত্নে ও ধৈর্যে প্রতিক্ষণ তাঁর গদ্যকাজগুলিকে অন্ধকারের আড়াল সরিয়ে পাঠকের বিস্ময়স্তম্ভিত চোখের সামনে উপস্থাপিত করা শুরু করেছিল গত শতকের আটের দশক থেকে। ২০০৪-এর পর জীবনানন্দ দাশের রচনা কপিরাইটমুক্ত হলে অন্য অনেক প্রকাশনা সংস্থাই এই গল্প উপন্যাসগুলি ছাপতে শুরু করেন, মূলত এবং স্বাভাবিকভাবে প্রতিক্ষণ-এর মুদ্রিত সংস্করণগুলিকে অবলম্বন করেই, যেহেতু প্রতিক্ষণ-এর মতো মূল পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আমরা এতে আপত্তির কিছু দেখি না, এভাবে বরং জীবনানন্দ আরও বেশি পাঠকের কাছে পৌঁছে যাচ্ছেন। আমরা শুধু নির্ভুল পাঠের পক্ষে সওয়াল করব।

বর্তমান উপন্যাসটি ভূমেন্দ্র গুহর সম্পাদনায় *চারটি উপন্যাস*-এ সংকলিত ছিল। জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসগুলিকে পৃথকভাবে প্রকাশ করার যে পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি, তারই অংশ হিসাবে একক বই আকারে এই প্রথম বর্তমান উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল ২০২২-এ, ভূমেন্দ্র গুহ-কৃত সম্পাদকীয় নোট সহযোগে। দ্বিতীয় মুদ্রণে, বলা বাহুল্য, তা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

নির্বাহী সম্পাদক, প্রতিক্ষণ
কলকাতা বইমেলা, ২০২৩

আমরা চার জনে ছিলাম—

অনাথ মনে-মনে ভাবত সে একদিন এমন একখানা উপন্যাস লিখতে পারবে যার ইংরেজি অনুবাদ করে বিলেতি পাবলিশারের হাতে দিয়ে সে অন্তত হাজার পঞ্চাশেক টাকা পাবে—

টাকাই শুধু অনাথের উদ্দেশ্য নয়—যশও সে চায়। কিন্তু যথেষ্ট টাকার ওপর দম দিয়ে বসতে না পারলে ক্ষমতা প্রতিভা মর্যাদা সমস্তই খুব অসার আমাদের কাছে, প্রায়ই বলে।

তার কথা যে খুব সত্য, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু তবুও সে-কথাগুলোকে তাদের মূল্যাতিরিক্ত দাম দিয়ে সময়ে-অসময়ে যদি গ্রহণ করবার জন্য আমরা প্রস্তুত না থাকি, তা হলে তার ভালো লাগে না।

আমাদের সকলের মতোই অনাথও বড্ড দরিদ্র—একটা চাকরি থাকলেই হয়তো তার ভালো হত; কিন্তু, ডাকসাইটে একখানা নেয়াপাতি উপন্যাস লিখবার সাধ তার।

উদ্দেশ্য হচ্ছে, বাংলায় উপন্যাস শেষ করে একটা বাঙালি পাঠকদের বুঝে নেবে— বিশেষ কোনও ভরসা এ-দিক দিয়ে পোষণ করে না সে। কাজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে বইখানা সে জোনাথন কেপ বা মার্টিন সেকাল বা হডার বা জন লেন-এর হাতে দিয়ে দিবে। অনাথ আশা করে, তারপর তার সব ঠিক হয়ে যাবে—কোথাও বিশেষ কিছু কুঁচকে থাকবে না আর তার সংসারে, জীবনে।

বইয়ের বিক্রির থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা যা হাতে আসবে তার, তা-ই দিয়ে বালিগঞ্জের দিকে ছোটখাটো একটা নিরিবিলি বাড়ি তৈরি করবে— সারাটা জীবন নিজেও বিড়ি ফুঁকে কাটাবে (চুরুট সিগারেটের চেয়ে বেশি ভালোবাসে বিড়ি)।

কিন্তু গল্প লিখতে বসে অনাথ এ-সব উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যেত—আমি লক্ষ করে দেখেছিলাম, সত্যিই লেখাই ছিল তার কাম্য—টাকাও নয়, সম্মান-প্রতিপত্তিও নয়।

এ-জন্য অনাথকে শ্রদ্ধা করতাম; মনে হত, লেখকের প্রতিভা তার ভেতর থাক না-থাক, একজন ভালো লেখকের অবহিতি-সমাহিতি ভাব তার আছে। একটা গল্পকে মনের মতো করে দাঁড় করাবার জন্য সে অনেক কিছু সুখের ও আরামের জিনিস ত্যাগ করতে রাজি আছে—

অনাথ বলেছিল, সে চোদ্দো বছরের থেকেই লিখছে; এখন বয়স তার বত্রিশ। এর মধ্যে সে পনেরোখানা উপন্যাস ও আড়াইশো গল্প লিখেছে; কিন্তু এ-সবের প্রায় কিছুই তার কাছে নেই। অনেক লেখা উইয়ে কেটেছে, কেটে শেষ করেছে—বাকিগুলো সে নিজেই ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

বলেছিলাম : এ কী করলে, অনাথ—করলে কী—

—কিছু না, ঠিক আছে।

এই ঝর্ঝরে বোধ-বিচারের জন্য আমরা সকলেই তাকে খুব ধন্যবাদ দেই। একটা কথা ভেবে সবচেয়ে আশ্চর্য হই এই যে, এত লিখেও সে কোনও দিন একটা লেখাও কোনও পত্রিকা বা প্রেসে ছাপাতে যায়নি।

লিখবার ক্ষমতা থাক আর না-থাক, লেখার—বিশেষ করে নিজের লেখার—মূল্য নির্ণয়ের ব্যাপারে তার চেতনা, সংযম রয়েছে।

তবুও ভরসা হারাবার, হাল ছেড়ে দেবার মানুষ সে নয়।

নিজের উপন্যাসটাকে সে ইংরেজিতে অনুবাদ করবে—তারপর জোনাথন কেপ বা জন লেন-এর হাতে দেবে—ইউরোপ আমেরিকা তার মর্যাদা বুঝবে—হাজার পঞ্চাশেক টাকা অন্তত পাবে সে—বালিগঞ্জের দিকে ছোট ফিটফাট একটা আস্তানা তৈরি করে আজীবন লেখা নিয়ে থাকবে সে; তখন খুব দামি চুরুটই খাবে সে—মাঝে-মাঝে রবারের পাউচে খানিকটা মার্কোপোলা তামাকপাতা, একটা ব্রায়ার পাইপ পকেটে রেখে—একটা কোডাক হাতে এখানে-সেখানে—নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াবে—অনাথ যখন এই সব বলত, তখন শুনতে ভালোই লাগত আমাদের—

একজন মানুষের লেখাপড়া ড্রয়িংরুম ও শোবার ঘরের জন্য যতটুকু জায়গা লাগে, বলত : আমার বাড়িটা খুব ছোট করে তৈরি করব অবিশ্যি; কিন্তু, খাঁটি ভারতীয়—বঙ্গীয়—আর্ট অনুসারে হবে বৈকি—

—মানে ওরিয়েন্টাল টাইপ?

—না, না—

—মুঘল?

—মোগলরা আসবার আগে এ-দেশে যে-রকম ছিল—

—বৌদ্ধ মন্দিরের মতো?

—ছি! সে-রকম টিপি তো একটা কেলেঙ্কারি—

শিব-মন্দিরের কথা ভেবেও তার মন উঠত না—বাংলা দেশের পুরোনো মঠের নমুনার চেয়েও হৃদয় তার ঢের দূরে ছিল; সে মাঝে-মাঝে এক-একটা নকশা এঁকে দেখাত—তার বাড়িটা কেমন হবে।

দেখতাম, তা শেষ পর্যন্ত আজকালকার একটা জ্যামিতির টানের মনোলোভা খেয়াল-খুশির বাংলোর মতো—অনেকখানি; বাকিটা অনাথের নিজের শোভনা মনোভেলা, কেমন যেন স্বর্গীয় রেখায় টানা—কিন্তু পার্থিবতা। বুঝতে পারতাম না, এর ভেতর ভারতীয় কতখানি—সাহেবিই-বা কতটুকু—

কিন্তু বাংলোর পেনসিলের স্কেচটুকু ভালো লাগত বেশ। এমন পরিষ্কার ভাবে আঁকা। আঁকবার হাতও অনাথের এমন নির্মল সপ্রতিভ।

অবাক হয়ে ভাবতাম : সে ইঞ্জিনিয়ার হলেই তো পারত। উপন্যাস লিখবার সাধ না হলে তো হত তার; হলই-বা যদি, তা হলে আটলান্টিকের এ-পারে ও-পারে উপন্যাসের জনপ্রিয়দের দেশে জন্মালে হত—

—বাড়িটার চারপাশে মাঠ থাকবে—

—খুব বড়ো মাঠ?

—না, বাড়ি আর মাঠের জন্য বড়ো জোর পনেরো-কুড়ি হাজার টাকা খরচ করতে আমি রাজি।

—জায়গা-জমি তো সস্তা নয় কলকাতায়—

—আমি থাকব কলকাতার একেবারে সীমান্ত পেরিয়ে—ইঁদুর-বেড়াল-পচানি সতী- অসতী-কুষ্ঠ-হেঁপো গাজানির মধ্যে একটেরে ঘুঘুডাঙা বা চেতলা বা বেহালা-সোনারপুরে—

—সেখানেও দাম চড়া—খুব চড়া

—ছোট একটা বাড়ি—ছোট একটা লন—চারদিকে মেহেদি-ঝোপের বেড়া—

বলে অনাথ চুরুটে টান দিত। অনাথের বলবার ভঙ্গি সরস ছিল। কান দিয়ে শুনতাম, তার পর ফুরিয়ে যেত বটে, কিন্তু অনাথের দু-চার মুহূর্তের পরিকল্পনার ফলসা দেয়ালা না শুনে পারা যেত না। মেসের থেকে মেসে—মেসে থেকে-থেকে—তার চেয়েও খারাপ ভাড়াটে, আশ্চর্য অন্ধকারে আমরা জীবন কাটাচ্ছিলাম। তবুও আমরা বাঁচব—ভালো হব—একদিন নীল আকাশের সূর্যডাঙায় পড়ব গিয়ে—আশা করেছিলাম।

অনাথ চুরুট নামিয়ে বলত : হাঁটঝাউ বনঝাউ ফার পাম পাইন এ-মাটিতে যা বাঁচে—তার কয়েকটি গাছ থাকবে, দিশি বকুল, জামরুল, লিচু, কুল, আম, নিম, আমলকি, বাকি জায়গায় নানা রঙের ক্যানা, আর মাঠের আনাচে-কানাচে মটরফুল,